অপূর্ণায়ন

দ্বন্দ্বের অপর্ণায়ন, স্বপ্নের অপূর্ণায়ন

অপর্ণার অপূর্ণায়ন

তসলিমা নাসরিন

ফিফটিন পার্ক এভিনিউ অপর্ণা সেনের সবচেয়ে নিখুঁত নির্মাণ। দক্ষ হাতের কাজ, জানি। তারপরও আমার বলতে দ্বিধা নেই যে অপর্ণার *পরমাই* আমার মতে দ্য বেস্ট।

মানসিক রোগী নিয়ে ছবি অনেক হয়েছে। সবার মধ্যে দাঁড়িয়ে ছরছর করে পেচ্ছাব করে দেওয়া, মুখ বিকৃত করে কাঁদা, খেতে গিয়ে গালে গলায় খাবার লাগিয়ে ফেলা -- দেখতে যেহেতু এসব অশোভন, বেশির ভাগ পরিচালকই এড়িয়ে চলেন, দেখান না। অপর্ণা দ্বিধা করেননি ছবির প্রধান চরিত্রকে দিয়ে *অশোভন* কাজগুলি করিয়ে নিতে। অনেকটা অপ্রিয় সত্য কথা বলার মতো। সাহস দেখিয়েছেন একজন নারীকে দিয়ে এই অভিনয়টি করিয়ে। পুরুষের অসুন্দর হতে ক্ষতি নেই, নারীর সবকিছু হতে হবে ঝলমলে এবং সুন্দর, নারী মানসিকভাবে সুস্থ হোক কী অসুস্থ হোক --সোসাইটি এবং সিনেমা দুই জগতের এই নির্ধারিত নিয়মটি অপর্ণা মানেননি। না মেনেই তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন নিয়ম না মানলেও হয়, না মেনেও সফল হওয়া

যায়। অসম্ভব ভালো অভিনয় করে অপর্ণার সাফল্যের মাত্রাকে আরও উঁচুতে তুলেছেন কঙ্কণা সেনশর্মা। আত্মহত্যা করতে গিয়ে প্রতিরোধের মুখে পড়ে কঙ্কণার যে অভিনয়, কনভালশান হওয়ার সময় যে অভিনয় তার তুলনা হয় না।

সোসাইটির অন্য অনেক নিয়মই চমৎকার মানা হয়েছে এ ছবিতে। অঞ্জলি, বাড়ির বড় মেয়েটি পরিবারের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করে। একটি মেয়ে যদি ত্যাগী হয়, নিজের আমোদ প্রমোদ নির্বাসন দিয়ে অন্যের সেবায় নিয়োজিত হয়, সকলে খুব ভালো বলে সেই মেয়েকে। অঞ্জলিকে তাই সংসারে সবাই ভালো বলে। ভোগী মেয়েদের কেউ ভালো বলে না। ভোগ বা বিলাস পুরুষের জন্য, মেয়েদের জন্য কখনই নয়। অঞ্জলি বা অনুর মতো চরিত্র এ সমাজে প্রচুর, যাদের কখনও নিজের কথা ভাবার সময় হয় না। যে সমাজে ইন্ডিভিজুয়ালিজমই মূলমন্ত্র, পশ্চিমের সেই সভ্য সমাজে অঞ্জলিকে বলা হবে *বোকা।* যুক্তি হল, জীবন যার যার তার তার। আর, মানুষের একটিই যেহেতু জীবন, এই অমূল্য জীবনটিকে নিজের পছন্দমতো যাপন না করে কাউকে দান বোকাবুদ্ধুরাই করে। বুঝি, কিন্তু তার পরও জগতের কোথাও কোথাও মানবতার গল্প থাকে। *ফিফটিন পার্ক এভিনিউ*-এর গল্পের মতো গল্প। মানুষের জন্য মানুষের মমতার গল্প, এই গল্পগুলো আছে বলে এই হিংসের-ঘৃণার-যুদ্ধের জগৎকে মাঝে মাঝে আশ্চর্য সুন্দর মনে হয়।

কেবল স্কিৎসোফ্রেনিয়ায় ভোগা এক মেয়ের কল্পনার জগতের সঙ্গে বাস্তবের সংঘাত দেখাননি অপর্ণা। আরও অনেক কিছু দেখিয়েছেন। দুটি দৃশ্য উল্লেখযোগ্য।

দৃশ্য ১, *কলেজে পদার্থ বিজ্ঞানের কোয়ান্টাম মেকানিজম শেখাচ্ছে অঞ্জলি আর বাড়িতে ভূত তাড়ানোর জন্য তারই বোন মিঠিকে ঝাটাপেটা করছে ওঝা।* দৃশ্য ২, *বাড়ির বাইরে হাঁটতে হাঁটতে জয়দীপকে তার হ্যালুসিনেশনের গল্প বলছে মিঠি, আর বাড়ির ভেতর অদৃশ্য কারওর স্বর শোনা বা হ্যালুসিনেশনের অন্য একটি গল্প জমে উঠেছে, এই হ্যালুসিনেশনটি আধিভৌতিক।* একটি বিজ্ঞান আর একটি অবিজ্ঞান। প্রথম দৃশ্যটিতে কেটে কেটে একটি ঘটনার পেটে আরেকটি ঘটনা ঢুকিয়ে বিজ্ঞানের ঘরে অবিজ্ঞানের অবাধ প্রবেশকে চোখে আঙুল দিয়ে অপর্ণা বুঝিয়ে দিয়েছেন। দ্বিতীয় দৃশ্য দেখে বুঝে নিতে হয়, (বুঝে নেওয়া এবং বুঝিয়ে দেওয়া এই দুটির মধ্যে কিছু পার্থক্য থাকে। বুঝিয়ে দিলে মাথায় ঢোকে, বুঝে নিলে অন্তরে) যে, মাথায় সমস্যা থাকলেই হ্যালুসিনেশন হয়। সমস্যা একটি *অরগানিক,* অন্যটি *অরগানিক নয়। অরগানিক নয়* –সমস্যাটির কারণ অশিক্ষা, কুশিক্ষা, ধর্ম, কুসংস্কার। মানসিক রোগগ্রস্তের হ্যালুসিনেশন থেকে মানুষ দুরে সরে থাকে, অশিক্ষা আর অজ্ঞতা থেকে উদ্ভুত হ্যালুসিনেশনের দিকে মানুষ আকৃষ্ট হয়। বড় বীভৎস এই সত্য।

নিজের একটি কল্পনার জগৎ সবারই থাকে। সুস্থ অসুস্থ সবারই। কেউ তার কল্পজগৎটিকে বাস্তব বলে ভাবলে তাকে *মানসিক রোগী* বলে চিহ্নিত করা হয়। মানসিক রোগী নয়, এমন মানুষের বাস্তবতাও আমরা দেখেছি যে একরকম নয়। কার বাস্তবতা তবে বেশি বাস্তব? অধিকাংশ মানুষ যাকে বাস্তব বলে দাবি করছে সেটাই কি আসলে বাস্তব? নাকি সমষ্টির ওপর নির্ভর না করে তা ব্যক্তির ওপর

নির্ভর করে! এই প্রশ্ন একটি কমপ্লেক্সিটির উদ্ভাবন করে, যে কমপ্লেক্সিটি ছবিটির মান অনেকটা বাড়িয়ে দিয়েছে। এ তো গেল বাস্তবতা নিয়ে প্রশ্ন। আরও একটি জটিল প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছে লক্ষ্মী, জয়দীপের স্ত্রী। জয়দীপ যখন জানায় যে মিঠি এমন কিছু খুঁজছে যা কোনওদিন সে পাবে না, তখন লক্ষ্মী বলে, *আমরা সবাই কি তা-ই খুঁজছি না?* লক্ষ্মী হয়তো স্বামীর মিঠি-মায়ায় ঈর্ষান্বিত হয়ে বলে এ কথা। কিন্তু এ যে কী ভয়ঙ্কর সত্য! যে ঠিকানার অস্তিত্ব নেই, মিঠির সেই ঠিকানা খোঁজাকে আমরা *মাথার দোষ* বলি। কিন্তু আমরা তো সবাই স্থায়ী-সুখের ঠিকানা খুঁজে বেড়াই মনে মনে। আমাদেরও কি মাথার দোষ আছে তবে?

ছবিটিতে আরও একটি দৃশ্য দেখিয়েছেন অপর্ণা, যে দৃশ্যটি মেয়েদের খুব চেনা। হোটেলের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে থাকা দুই যুবকের কদর্য মন্তব্য শুনতে শুনতে আশঙ্কায় কুঁকড়ে মিঠি হাঁটছে। এই ভয়াবহ নারীবিরোধী সমাজে যে কোনও মেয়েকে এমন ঘটনার মুখোমুখি হতেই হয়, সইতেই হয় অত্যাচার। প্রতিবাদ কজন করে বা করতে পারে? হোটেলের ঘরে একপাল পুরুষ মিঠিকে ধর্ষণ করে মিঠির রক্তাক্ত শরীরটি টেনে ফেলে রাখে বারান্দায়। যে কোনও মেয়ের জীবনে যে কোনও সময় যে কোনও স্থানেই এ ঘটনা ঘটতে পারে। প্রতিটি মেয়েই এ কথা মনে মনে জানে, বাইরে বলুক বা না বলুক। ধর্ষিতা না হয়েও সব মেয়েরই কল্পজগতে মূর্তিমান আতংকের মতো ধর্ষণের একটি দৃশ্য থাকে। থাকতে থাকতেই দৃশ্যটি চেনা হয়ে যায়। তাই ধর্ষণের দৃশ্যটিও, দায়িত্ব নিয়েই বলছি যে মেয়েদের বড় চেনা।

নারীর অসহায়তা চমৎকার ফুটে উঠেছে জয়দীপের স্ত্রী লক্ষ্মীর চরিত্রে। আর সব নারীর মতোই লক্ষ্মী নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। স্বামী তার নিরাপত্তা। অর্থকড়ির প্রসঙ্গ যদি নাও আসে, স্বামীর ভালোবাসাও তার নিরাপত্তা। যখনই সে জানে যে স্বামী এগারো বছর আগের প্রেমিকা মিঠির খোঁজ পেয়েছে, লক্ষ্মী বড় দুর্বল হয়ে পড়ে, বড় উদ্বিগ্ন সে। কিন্তু স্বস্তি পায় মিঠির রোগের কথা শুনে। সুস্থ নারী আর এক সুস্থ নারীকে প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবে, অসুস্থ নারীকে নয়। কারণ এ বিশ্বাস লক্ষ্মীর আছে যে, কোনও অসুস্থ নারীর প্রেমে তার স্বামী পড়বে না। পুরুষের ভালোবাসা পাওয়ার জন্য পুরুষের মন এবং শরীর তৃপ্ত করতে মরিয়া হয়ে ওঠে দুর্বল নারীরা। সুন্দর একটি সঙ্গম দৃশ্যের পর স্বামীর বুকে মাথা রেখে শুয়ে আছে লক্ষ্মী। লক্ষ্মী কি খুব নিশ্চিন্ত! না। মিঠি জয়দীপকে জোজো বলে ডাকতো শুনে লক্ষ্মী আবার নিস্তেজ হয়ে পড়ে, মিঠি মানসিক রোগী জেনেও পড়ে। মিঠিকে কখনও চুমু খেয়েছিল কিনা স্বামী, দুজনের যৌন সম্পর্ক হয়েছিল কি না, না হলেও স্বামীর কখনও সেই ইচ্ছে হয়েছিল কি না জানার জন্য অস্থির হয়ে ওঠে লক্ষ্মী। চোখের জল উপচে উঠছে, টেনশনে তাকে সিগারেট খেতে হচ্ছে। শেষ অবদি লক্ষ্মীকে শান্ত করে মিঠির গণধর্ষণের খবর। ধর্ষিতা কোনও মেয়েকে নিশ্চয়ই তার স্বামী কামনা করবে না। নারীর *নিরাপত্তাহীনতা* কী নির্মমতায় ফুটে উঠেছে এসব দৃশ্যে!

পরমা যদি এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজকে অস্বীকার করে একধাপ এগিয়ে যাওয়া হয়ে থাকে, *ফিফটিন পার্ক এভিনিউ* কিন্তু দু ধাপ পিছিয়ে যাওয়া। গণধর্ষনের শিকার

হওয়ার পর মিঠির স্কিৎসোফ্রেনিয়ার উপসর্গ হঠাৎ বৃদ্ধি পায়। মিঠির অবসেশন স্বামী সন্তান নিয়ে একটি সংসার। কিন্তু, এই সমাজে স্বামী সন্তানের সংসার তো নারীর জন্য বন্দিত্ব ছাড়া কিছু নয়! এই বন্দিত্বটি ধর্ষিতা মিঠির কাঙ্খিত। কেন? ধর্ষণের প্রতিশোধ নেওয়া কি কাঙ্খিত হতে পারত না?

প্রেমিকা ধর্ষিতা হয়েছে বলে যে-প্রেমিক অবলীলায় পালিয়ে গেল, হতে যাওয়া বিয়েটিকে বাতিল করে দিয়ে, সেই প্রেমিকের প্রতি *পরমার* পরিচালক অপর্ণা সেনের সহানুভূতি দেখে শঙ্কিত হয়েছি। মিঠির প্রেমিক জয়দীপ মূলত অপ্রেমিক। এই অপ্রেমিকটি অথবা অনুর ভাষায় বাস্টার্ডটি মিঠিকে ছেড়ে অক্ষতযোনী বা অধর্ষিতা বা অনাঘ্রাতা কাউকে বিয়ে করে সুখের সংসার করছে। এমন সময় একদিন মিঠিকে দেখে *মায়া* জাগে তার। এই মায়ায় বা করুণায় সে অসুস্থ মিঠির পাশে এসে দাঁড়ায়, এবং দর্শককুল অতীত ভুলে গিয়ে জয়দীপের স্বার্থপর মনটিকে নিমেষে ক্ষমা করে দেয়। এর মাধ্যমে অপর্ণা কী করলেন? এক অপ্রেমিক পুরুষের, নারীর প্রতি করুণাকে, মহান করে তুললেন।

না, নারীর করুণার প্রয়োজন নেই। নারীকে মানুষ হিসেবে সম্মান কর, শ্রদ্ধা কর, নয়ত ফোটো। এমনও তো হতে পারতো। একজন স্বনির্ভর সচেতন নারী-চিত্রনাট্যকার-পরিচালকের কাছে দলিত দংশিত ধর্ষিত নারীকুল তা-ই আশা করে। কিছু তাদের শক্তি বা সাহস জোগাক, চায়। অবশ্য সকলের চাওয়া মেটানোর দায়িত্ব তো অপর্ণা সেন নেননি। তিনি তাঁর কাজ করেছেন, ভালো ছবি বানিয়েছেন। ছবি বানাতে গেলে তাঁকে নারীবাদী হতে হবে, তাই বা কে বলেছে! *সপরিবারে দেখার*

মতো একটি ছবি বানিয়েছেন, এটিই হয়তো যথেষ্ট। ছবিটি দেখা শেষ হলে মিঠি কোথায় হাওয়া হয়ে গেল এ নিয়ে দর্শকদের মধ্যে বেশ জল্পনা-কল্পনা চলবে। মিঠির জন্য মিঠির অপ্রেমিকটির যেমন করুণা হয়, তেমন হবে সবার। *আহা, বেচারির মাথাটি সুস্থ হলো না, সংসার হলো না, স্বামী সন্তানও জুটলো না* -- এই করুণার উদ্রেকটি সকলের মধ্যে হওয়ানোয় অপর্ণা সেন সার্থক।

উচ্চবিত্ত বাঙালি পরিবারের গল্প এটি। বাঙালি হয়েও এলিট ক্লাস ইংরেজিতেই বেশির ভাগ সময় কথা বলে, বাংলাতেও কিন্তু বলে কথা। ছবির কিছু সংলাপ বাংলায় হওয়া উচিত ছিল, তাতে *বাস্তব* হতো ব্যাপারটি। অবশ্য অপর্ণা এখন বলতে পারেন, আমার বাস্তবতাটি আমার, তোমারটি তোমার।

নারীবাদী ছবি না হলেও ছবিতে নারীই প্রধান। সাধারণত ভারতীয় ছবিতে পার্শ্ব চরিত্রের জন্য বরাদ্দ থাকে নারীকুল। এ ছবিতে এক নারীর সমস্যা আরেক নারী সমাধান করছে। এক নারীর কষ্টে আরেক নারী কাঁদছে। নারীদের পারস্পরিক মহমর্মিতা, তাদের একতাই ভবিষ্যতে নারীবিরোধী সমাজকে ভাঙতে পারে -- এ বিশ্বাস অনেকের। আমারও।

প্রথা ভেঙে *পরমাকে* বাইরে এনেছিলেন অপর্ণা সেন। বাইশ বছর পর প্রচলিত সংসারকাঠামোয় ঢুকে গিয়ে (যে কাঠামোয় ঢোকার স্বপ্ন মিঠির, যে কাঠামোয় অঞ্জলি ঢুকতে চায় কুনালের হাত ধরে, যে কাঠামো আঁকড়ে ধরতে চায় লক্ষ্মী) তিনি নারীর সুখ-দুঃখের গল্প শোনাচ্ছেন। স্বামী সন্তান নিয়ে সে সুখে আছে--এটি কি

কেবল রোগগ্রস্ত মিঠিরই হ্যালুসিনেশন, এই জাঁকালো পিতৃতন্ত্রে প্রতিটি মেয়েই তো ভোগে এই হ্যালুসিনেশনে! অপর্ণা সেন কি এই হ্যালুসিনেশনই ছড়িয়ে দিতে চাচ্ছেন জেনেশুনে?